পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

সন্তান মিথ্যে বলছে?

মোকাবিলা করুন পজিটিভভাবে

বিপাশা চক্রবর্তী

অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে সন্তানকে বড় করে তোলেন তাঁর বাবা-মা। এই স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাঁদের মায়া-মমতা, ভরসা ও বিশ্বাস। তার হাজারো রকমের দুষ্টুমি ও বায়নাক্কা সামলে নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চলেন অভিভাবকেরা। তবে কখনও কখনও এই সমস্ত সুন্দর মুহূর্তগুলির মাঝখানে কিছু বিপত্তি আসতে পারে। হঠাৎ কখনও কখনও আপনার নিজের সন্তানটিকেই যেন আপনার অচেনা মানুষ বলে মনে হয় । মনে হতে পারে ক্ষুদের আচার-ব্যবহারে যেন কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ সে হয়তো মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। প্রথমে এই ধরনের ব্যবহারে আপনি প্রচণ্ড রেগে যেতে পারেন, পাশাপাশি আপনার মনে হতে পারে আপনার সন্তানের এই ধরনের মনোভাব কোথা থেকে এল। কিন্তু প্রথমেই এই ধরনের কোনও মনোভাব পোষণ করার কোনও দরকার নেই। তার পরিবর্তে আপনি বাড়ির শিশুটির সঙ্গে সুস্থ একটি সম্পর্ক গড়ে তুলুন। যেখানে সব কথা সে অপকটে আপনার কাছে স্বীকার করতে পারে, অর্থাৎ তাকে একটি জায়গা দেওয়া যাতে সে নিজেকে বাড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে মনে করতে পারে। ছোট বলে তাকে কখনওই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। ক্ষুদেটি যদি কিছু বলতে চায় তাহলে তার কথা অতি মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত।

সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার যে, ক্ষুদেটি কেন মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে। আপনাকে কিছু বলতে এলেই কি আপনি খুব রেগে যান। না, তাকে এড়িয়ে যান। এই ধরনের কোনও কাজই আপনি তার সঙ্গে করবেন না। এটি আপনার বোঝা উচিত।

অনেক সময়ে এমন পরিস্থিতি হয়, আপনি নিজে কোনও কারণে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হন। আর সেই কাজটি হয়তো আপনি আপনার সন্তানের সামনেই করছেন। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক কিন্তু আপনাকে নকল করবে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল সেই বিচার করার বয়স তার নেই। কারণ আপনি যা করবেন সেটিই তার কাছে ঠিক বলে মনে হবে। তাই নিজেকে তার কাছে সচেতন ভাবে পেশ করুন। যাতে আপনার সন্তানের আপনার প্রতি ভালো ভাবমূর্তি তৈরি হয়। মাথায় রাখবেন একটি শিশু জন্মের পরে তার পুরো জগৎ বলতে শুধু আপনারা। অনেক সময় আমরা দেখি একজন শিশু তার মায়ের শাড়ি পড়ে নিজেকে সাজাতে চায়, এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক একই রকম। অর্থাৎ সে আপনার নকল করছে।

এরপর সাতের পাতায়

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে পড়ো

পাঠ্যবই ভালো করে খুঁটিয়ে পড়লে ছেলেমেয়েরা আরও বেশি উন্নতি করতে পারবে বলে আমার মনে হয়। বইয়ের প্রতিটি লাইন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত। সেইসঙ্গে প্রতিটি বিষয় পড়ার জন্য আলাদা সময় রাখতে হবে। একটি নির্ধারিত রুটিন মেনে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারলে খুব ভালো হয়। প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পড়ার সুবিধে হল সেই বিষয় সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞান অর্জন করা। এরফলে তারা প্রশ্ন-উত্তর বাড়িতে তৈরি করে অনুশীলন করতে পারবে। এতে তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও তৈরি হবে। পরীক্ষায় তারা প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে চট করে ঘাবড়ে যাবে না। আসলে প্রতিটি বিষয় মনোযোগ সহকারে পড়ার মজা হল পড়ুয়াদের প্রতিটি বিষয়ের ওপর ধারণা তৈরি হওয়া। এই অভ্যাস ছোট থেকে গড়ে তোলা জরুরি। ভালো করে পড়ার পর যদি একবার লিখে অভ্যাস করা যায় তাহলে আরও ভালো হয়।

ভক্ত দাস শিক্ষক, ফুলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মা.) ফুলবাড়ি, কোচবিহার

সেইসঙ্গে বলব শুধু যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বা গৃহশিক্ষক যে প্রশ্নপত্র তৈরি করে দিলেন তার ওপর নির্ভর করে থাকলে নিজেদেরই ক্ষতি। কারণ আমি মনে করি প্রতিটি ছেলেমেয়ের প্রাথমিক জ্ঞান জোরদার হওয়া দরকার। তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।

তবে সমস্যা হলে শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা অবশ্যই সাহায্য নেবে।

এরপর চারের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

বুঝতে অসুবিধা হলে সেটা বার বার পড়ি

অর্পিতা এখন ক্লাস এইটে পড়ে। সে পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সচেতন। তার জীবনের একটাই লক্ষ্য। সেটা পূরণ করার জন্য সে এখন থেকেই নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করছে। পড়াশোনার পাশাপাশি তার নম্র, বিনয়ী ব্যবহারের জন্য সকলেই তাকে খুব ভালোবাসে। সে কীভাবে পড়াশোনা করে, কেমনভাবে চলে তার অধ্যাবসায় সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই উত্তরণের মুখোমুখি অর্পিতা।

অর্পিতা সরকার অষ্টম শ্রেণি, ফুলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় (উ.মা.), কোচবিহার

উত্তরণ: পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট রুটিন আছে?

অর্পিতা: হ্যাঁ, আমি একটা রুটিন তৈরি করে নিয়েছি। যেভাবে আমার সুবিধা হয়। সকালে ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসি। ন'টা পর্যন্ত পড়ি। আর বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে রেস্ট নিয়ে তারপর সন্ধেবেলা ছ'টায় পড়তে বসি। তখন ১১টা পর্যন্ত পড়ি। টিউশন যেদিন যেদিন থাকে না সেই অনুযায়ী একটা রুটিন করা আছে।

উত্তরণ: প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কি আলাদা করে সমান সময় দাও?

অর্পিতা: প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্যই আলাদা করে সময় দিই। তবে কোনও বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে বা সমস্যা হলে সেটা বারবার পড়ি।

উত্তরণ: অনেকক্ষণ একভাবে বসে পড়তে একঘেয়ে লাগে না?

অর্পিতা: যখন একঘেয়ে লাগে, তখন মায়ের সঙ্গে একটু গল্প করি নাহলে গান শুনি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

অর্পিতা: সায়েন্সের সব বিষয়ই আমার ভালো লাগে। তবে অঙ্ক করতেই সবথেকে বেশি ভালো লাগে।

উত্তরণ: দিনে অঙ্ক কতক্ষণ প্র্যাকটিস করো?

অর্পিতা: প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে অঙ্ক প্র্যাকটিস করি।

উত্তরণ: বাড়িতে তোমাকে পড়াশোনায় কে সাহায্য করেন?

অর্পিতা: মা আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করে।

উত্তরণ: পড়াশোনা ছাড়া আর কী করো?

অর্পিতা: আমার গল্পের বই পড়তে খুব ভালো লাগে। গোয়েন্দা গল্প আমার খুব পছন্দের। আর অবসর সময়ে ছবি আঁকি। গেম খেলি। কখনও কখনও টিভি দেখি।

উত্তরণ: তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও?

অর্পিতা: আমি বড় হয়ে অঙ্কের শিক্ষিকা হতে চাই।

উত্তরণ: তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। তোমার আগামী দিনগুলোর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল।

দুইয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
ভারতীয় রেলওয়ে
তিনের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
কম্পিউটার
এডু অ্যাডভাইস
চারের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ক্লাস এইট-এর টিউশন
ভূগোল
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন ও
টেন-এর টিউশন
ইতিহাস
ছয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
জালিয়ানওয়ালা-
বাগের নৃশংস
হত্যাকাণ্ড
সাতের পাতায়
ক্যুইজ
এডু অ্যাডভাইস
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
চিনের প্রাচীর ও
একটি ইতিহাস

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

ভারতীয় রেল

ভারতীয় রেল (আইআর) একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেলওয়ে কোম্পানি যা ভারতে রেল পরিবহণ পরিষেবা দেয়। ভারতীয় রেল ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের মালিকানাধীন ও রেলমন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি বিশ্বের মোট ট্র্যাকের ১১৯৬৩০ কিলোমিটার (৭৪৩৩০ মাইল) সমন্বয়ে গঠিত চতুর্থ বৃহত্তম রেলওয়ে নেটওয়ার্ক। ২০১৫-এর শেষের হিসেব অনুসারে ৭২১৬ স্টেশনের সঙ্গে ৬৬৬৮৭ কিলোমিটার (৪১৪৩৭ মাইল)-এর রুটসহ ৯২০৮১ কিলোমিটার (৫৭২১৬ মাইল) ব্যবহৃত ট্র্যাক আছে ভারতীয় রেলের। ২০১৫-১৬ সালের হিসেবে ভারতীয় রেল ৮১০৭ বিলিয়ন যাত্রী বার্ষিক বা একদিনে গড়ে ২২ মিলিয়ন যাত্রীরও বেশি এবং বার্ষিক ১১০১ বিলিয়ন টন মাল বহন করে।

ভারতীয় রেলের যাত্রা শুরু কবে থেকে?

ভারতীয় রেলের যাত্রা শুরু ১৬ এপ্রিল, ১৮৫৩। যেদিন প্রথমবার ১৪টি মালবাহী বগি ও ৪০০ জন যাত্রীসহ প্রথম ট্রেনটি মুম্বই-এর বোরি বন্দর থেকে থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

ভারতীয় রেলের প্রথম পাতালরেল তথা মেট্রোরেল কোনটি?

কলকাতা মেট্রো ভারতীয় রেলের প্রথম পাতালরেল। ১৯৮৪ সালে প্রথম যাত্রা শুরু।

ভারতীয় রেলের প্রথম রেল ব্রিজ কোনটি?

মুম্বই-থানে রুটে 'দ্য পুরি ভাইডাক্ট' ভারতীয় রেলের প্রথম রেল ব্রিজ।

ভারতীয় রেলের ব্যস্ততম রেল স্টেশন কোনটি?

মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস (সিএসটি) ভারতীয় রেলের ব্যস্ততম রেল স্টেশন।

ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম দূরত্বগামী ট্রেন কোনটি?

অসমের ডিব্রুগড় থেকে বেঙ্গালুরুগামী 'বিবেক এক্সপ্রেস' ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম দূরত্বে যাত্রাকারী ট্রেন।

ভারতীয় রেলের প্রাচীনতম ডাইনিং ট্রেন কোনটি?

মুম্বই-পুনে ডেকান কুইন ভারতীয় রেলের প্রাচীনতম ডাইনিং ট্রেন।

২০০৫ সালে চালু 'ফ্লাইং রানি' ট্রেনটি ভারতীয় রেলের প্রথম দোতলা ট্রেন।

ভারতীয় রেলের সর্ববৃহৎ রেল কমপ্লেক্স কোনটি?

ভারতীয় রেলের সর্ববৃহৎ রেল কমপ্লেক্স হল হাওড়া।

ইউনেস্কো ভারতীয় রেলের কোন কোন জিনিসকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দিয়েছে?

ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস ও দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে, নিলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে, কালকা শিমলা রেলওয়েকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দিয়েছে।

ভারতীয় রেলে কবে প্রথম ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালু হয়?

১৯০৮ সালে প্রথম ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালু হয়।

ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে সর্বশেষ রেল স্টেশন কোনগুলি?

উত্তরে বারামুলা, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পুর্বে লেডো পশ্চিমে ভূজের কাছে নালিয়া।

ভারতীয় রেলের প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেনটি মুম্বইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস (ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস) থেকে কুরলা পর্যন্ত হারবার লাইন বরাবর সেন্ট্রাল রেলের ৯.৫ মাইল রাস্তায় ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ চলে।

ভারতীয় রেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত?

ভারতীয় রেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সাধারণত সর্বোচ্চ ২৪টি কামরা থাকে।

ভারতীয় রেলে প্রথম কম্পিউটারাইজড বুকিং কবে কোথায় হয়?

ভারতীয় রেলে প্রথম কম্পিউটারাইজড নিউদিল্লিতে ১৯৮৬ সালে হয়।

ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম রেল স্টেশনের নাম কী?

চেন্নাইয়ের ভেঙ্কটানরসিমারাজুভারিপেট্টা স্টেশনটির নাম দীর্ঘতম।

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে ছোট রেল স্টেশন নাম কোনটি?

ওড়িশার IB ও গুজরাটের আনন্দের কাছে OD রেল স্টেশন দুটির নাম সবচেয়ে ছোট।

ভারতীয় রেলের দুটি আন্তর্জাতিক ট্রেনের নাম কী কী?

মৈত্রী এক্সপ্রেস (কলকাতা থেকে ঢাকা, বাংলাদেশ)

সমঝোতা এক্সপ্রেস (দিল্লি থেকে লাহোর, পাকিস্তান)

থর এক্সপ্রেস (খোকরাপার, পাকিস্তান থেকে মুনাবাও)

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে নিকটবর্তী দুটি স্টেশনের দূরত্ব কত?

সেকেন্দ্রাবাদের সফিলগুডা ও দয়ানন্দ নগর স্টেশনের দূরত্ব ১৭০ মিটার।

ভারতীয় রেল কতগুলি জোনে বিভক্ত।

ভারতীয় রেল মোট ১৭টি জোনে বিভক্ত।

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে বড় জংশন স্টেশনটির নাম কী?

মথুরা ভারতীয় রেলের সবচেয়ে বড় জাংশন স্টেশন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলমন্ত্রীর নাম কী?

স্বাধীন ভারতের প্রথম রেলমন্ত্রীর নাম জন মাথাই।

ভারতীয় রেলের প্রথম মহিলা চালকের নাম কী?

ভারতীয় রেলের প্রথম মহিলা চালকের নাম সুরেখা যাদব।

ভারতের ৫০তম স্বাধীনতা দিবসে কোন বিলাসবহুল ট্রেনটি চালু করা হয়?

ভারতের ৫০তম স্বাধীনতা দিবসে স্বর্ণ শতাব্দী ট্রেনটি চালু করা হয়।

ভারতীয় রেলের কোন কৃতিত্বের জন্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পাতায় নাম উঠেছে?

২০০৩ সালে কালকা শিমলা রেলওয়ে ৯৬ কিমি এর ব্যবধানে সবচেয়ে বেশি চড়াই ওঠার জন্য গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পাতায় নাম করে নিয়েছে।

ভারতীয় রেলের দ্রুততম ট্রেন কোনটি?

হজরত নিজামুদ্দিন থেকে আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট গতিমান এক্সপ্রেস (ঘণ্টায় ১৬০কিমি সর্বোচ্চ গতি এবং ঘণ্টায় ১১২ কিমি গড় গতি) ভারতের দ্রুততম ট্রেন।

'হসপিটাল অন হুইলস' কোন ট্রেনকে বলে?

লাইফ লাইন এক্সপ্রেস-কে 'হসপিটাল অন হুইলস' বলে।

আগামী সংখ্যায়
জেনারেল নলেজ

নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ে

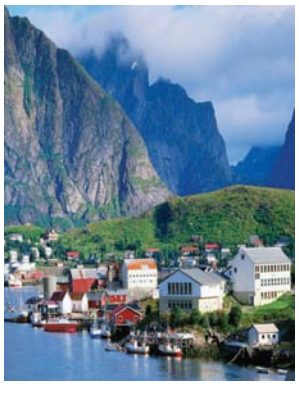

ভারতীয় রেলের সদর দফতর কোথায়?

ভারতীয় রেলের সদর দফতর নিউদিল্লিতে।

কোন সালে ভারতীয় রেলের জাতীয়করণ হয়?

১৯৫১ সালে ভারতীয় রেলকে জাতীয়করণ করা হয়।

ভারতীয় রেলের উচ্চতম রেল স্টেশন কোনটি?

দার্জিলিংয়ের ঘুম ভারতীয় রেলের উচ্চতম রেলস্টেশন।

ভারতীয় রেলের প্রাচীনতম রেলস্টেশন কোনটি?

মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস (সিএসটি) ভারতীয় রেলের প্রাচীনতম রেল স্টেশন।

ভারতীয় রেলের প্রথম রেল টানেল কোনটি?

'পার্সিক টানেল' ভারতীয় রেলের প্রথম রেল টানেল।

ভারতীয় রেলের প্রাচীনতম ট্রেন কোনটি?

বেঙ্গালুরু মেল ভারতীয় রেলের প্রাচীনতম ট্রেন।

ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম রেল স্টেশন কোনটি?

১.৩৫ কিমি দীর্ঘ গোরখপুর ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম রেল স্টেশন।

ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম ব্রিজ কোনটি?

ইডাপল্লি স্টেশন ও আইসিটিটি-র মাঝে ৪.৬২ কিমি ব্রিজটি ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম ব্রিজ।

ভারতীয় রেলের উচ্চতম ব্রিজ কোনটি?

জম্মু তাওয়াই ও উধমপুরের ঘাম্বির খাদ ব্রিজ ভারতীয় রেলের উচ্চতম ব্রিজ।

ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম রেল টানেল কোনটি?

কোঙ্কন রেলের অধীন কারবুদ টানেলটি ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম রেল টানেল।

ভারতীয় রেলের প্রথম দোতলা ট্রেন কোনটি?

ভারতীয় রেলের একমাত্র কোন স্টেশনে ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ তিন প্রকার লাইনই দেখা যায়?

শিলিগুড়ি স্টেশনে ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ তিন প্রকার লাইনই দেখা যায়।

ভারতীয় রেলের কোন ট্রেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক জায়গায় থামে?

হাওড়া অমৃতসর এক্সপ্রেস সবচেয়ে বেশি ১১৫ জায়গায় থামে।

ভারতীয় রেলের কর্মীসংখ্যা কত?

ভারতীয় রেলের কর্মীসংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ। কর্মীসংখ্যার বিচারে ভারতীয় রেল পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম সংস্থা।

ভারতীয় রেলের দীর্ঘতম দূরত্বগামী নন-স্টপ ট্রেন কোনটি?

ত্রিবান্দ্রম রাজধানী এক্সপ্রেস ৫২৮ কিমি দূরত্বগামী নন-স্টপ ট্রেন।

ভারতীয় রেলের প্রথম ইলেকট্রিক চালিত ট্রেন কোনটি?

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

মাইক্রোসফট এক্সেল

মাইক্রোসফট এক্সেল হচ্ছে একটি স্প্রেডশিট সফটওয়্যার। স্প্রেডশিট বা ওয়ার্কশিট হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল এর প্রধান অংশ। কম্পিউটারে এক্সেল প্রোগ্রামটি চালু হলে যে স্ক্রিনটি পাওয়া যায় তাই স্প্রেডশিড বা ওয়ার্কশিট। এই স্প্রেডশিড বা ওয়ার্কশিট এ ১৬,৬৮৪টি কলাম আর ১০,৪৮,৫৭৬টি রো এবং ১৭৪৯,৪৪,৪১,৯৮৪টি সেল রয়েছে।

কলাম: A, B, C... এগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের কলাম।

রো: 1, 2, 3... এগুলো হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেলের রো।

সেল: ছোট ছোট আয়তাকার ঘরগুলো হচ্ছে সেল।

সেল এড্রেস: একটি সেল কোন কলাম এবং কোন রো তে আছে তার অবস্থান কে সেল এড্রেস বলে।

স্প্রেডশিট কী কাজে লাগে?

সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব-নিকাশের যাবতীয় কার্যাবলি এক্সেলের মাধ্যমে করা যায়। সকল প্রকার হিসাবের তথ্যাবলি সংরক্ষণ, সম্পাদন, মান যাচাই করা যায়। ডাটাবেস কার্যাবলি সম্পাদন করা যায়। কোন তথ্য বা ডাটা উচ্চ বা নিম্নক্রম অনুসারে সাজানো যায়। মার্কশিট, সেলারিশিট, ক্যাশমেমো ইত্যাদি তৈরি করা যায়। বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন। আয়-ব্যয়ের হিসাব, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

স্প্রেডশিট শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল ছড়ানো পাতা। এখানে Spread শব্দের অর্থ ছড়ানো আর sheet শব্দের অর্থ পাতা। একসঙ্গে Spreadsheet অর্থ ছড়ানো পাতা। গ্রাফ কাগজের মতো X অক্ষ এবং Y অক্ষ বরাবর খোপ খোপ ঘরের মতো অনেক ঘর সংবলিত বড় শিটকে স্প্রেডশিড বলে।

এক্সেল-এর Worksheet:

এক্সেলের সুবিশাল পাতার যে অংশে কাজ করা হয় তাকে Worksheet বলে। মূলত স্প্রেডশিটই হল Worksheet. একটি খাতায় যেমন অনেকগুলো পাতায় লেখা যায়, এক্সেলেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্কশিট খুলে তাতে কাজ করা যায়।

Work Book:

এক্সেলের স্প্রেডশিটে বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করে তা বিশ্লেষণ বা পরিগণনা করা হয়। কাজ করার পর ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য কোনও নামে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত স্প্রেডশিটকে ফাইল বা ওয়ার্কবুক বলে।

Cell:

এক্সেলের ওয়ার্কশিটটি সারি(রো) ও কলামভিত্তিক। উপরে A, B, C, D&&&.. ইত্যাদি হল বিভিন্ন কলামের নাম এবং বাঁ-পাশের 1, 2, 3, 4, 5... ইত্যাদি হল সারি সংখ্যা। সারি ও কলামের পরস্পর ছেদে তৈরি ছোট ছোট আয়তকার ঘরকে সেল বলা হয়।

Title bar:

Excel Windows-এর শীর্ষদেশে Microsoft Excel-Book 1 লেখা বারটিকে Title bar বলে। সেভ করা কোনও ফাইল বা ডকুমেন্ট ওপেন করলে সেভ করা ফাইলের নামটি প্রদর্শিত হয়। এর ডান পাশে মিনিমাইজ, ম্যাক্সিমাইজ ও ক্লোজ বাটন থাকে।

Menu bar:

টাইটেল বারের নীচে File, Edit, View, Insart, Format, Data, Window, Help ইত্যাদি লেখা বারকে Menu bar বলে। Menu bar-এর প্রত্যেকটি অপশনই এক-একটা মেনু। এই মেনুগুলোর নীচে আন্ডারলাইন করা অক্ষরগুলো দিয়ে কি-বোর্ড কমান্ড করে ওই মেনু ওপেন করা যায়। যেমন Alt+F কমান্ড দিয়ে ফাইল মেনু ওপেন করা যায়।

Tool bar:

মেনু বারের নীচে বিভিন্ন প্রতীক সম্বলিত বারকে টুলবার বলে। প্রত্যেকটি প্রতীকের বাটনকে আইকন বা টুল বাটন বলা হয়। মেনু সিলেক্ট করে কোনও কমান্ড দেওয়ার চেয়ে এই টুল ব্যবহার করে খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যায়।

Formatting bar:

টুলবারের নীচের সারিতে বিদ্যমান বারটিই হল ফর্ম্যাটিং টুলবার। এতে বিদ্যমান বাটনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ব্যবহার করে ফন্ট পরিবর্তন, ফন্টের সাইজ ছোট-বড়, লেখাকে বোল্ড, আন্ডার লাইন, ইটালিক করা, লেখা অ্যালাইনমেন্ট করা, আউটলাইন দেওয়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যায়।

Formula bar:

ফর্ম্যাটিং টুলবারের নীচে লম্বা দু'টি অংশে বিভক্ত বারটিকে ফর্মুলা বার বলা হয়। ফর্মুলা বারের বাম পাশের অংশ যেখানে সেল অ্যাড্রেস প্রদর্শিত হয় সে অংশকে Name Box বলা হয়। মাউসের পয়েন্টার বা কার্সর যে সেল এ রাখা হবে Name Box -এ সেই সেলের অ্যাড্রেস প্রদর্শিত হবে। Name Box-এর ডান পাশেই Formula Box, এই বক্সে ফর্মুলা প্রদর্শিত হয়।

Vertical and Horizontal Scroll bar:

এক্সেলে অনেক বড় ডকুমেন্টে কাজ করার সময় পর্দায় সব দেখা যায় না। প্রয়োজন অনুসারে দ্রুত ডকুমেন্টের যে কোনও জায়গায় গিয়ে পর্দায় প্রদর্শন করার সুবিধার্থে পর্দার ডানদিকে ভার্টিকল স্ক্রলবার এবং পর্দার নীচে হরাইজন্টাল স্ক্রলবার আছে। এই স্ক্রলবার দুটোর ডানে ও বামে দুটো অ্যারো বাটন আছে। মাউসের পয়েন্টার দিয়ে এই অ্যারো বাটনে ক্লিক করে অথবা স্ক্রল করে উপর-নীচে ইচ্ছামতো দেখা যায় বা যাওয়া যায়।

এডু অ্যাডভাইস

পরীক্ষার খাতার খুঁটিনাটি

সারা বছরে যা কিছু পড়া বা শেখা হয় তার প্রতিফলন বা মূল্যায়ন পরীক্ষার খাতার মধ্যে দিয়ে হয়। নিজের যা কিছু জানা আছে তা যদি ঠিকভাবে প্রকাশ না করা যায়, তাহলে নম্বর আদায়ের সুযোগ কমে যায়। অনেকের কাছেই তাই এই পরীক্ষার খাতা আতঙ্কের বিষয়। কিন্তু আসলে তা একেবারেই নয়। প্রথমত ভয় পেয়ো না। ভয়ে সবকিছু ভেস্তে যেতে পারে। উত্তর তো ভুল হতেই পারে তার সঙ্গে বানান ভুল, কাটাকুটি, খাতা নোংরা হওয়া ইত্যাদি সমস্যাও তৈরি হবে। কিন্তু এগুলো কোনওটাই তো কাম্য নয়। তাই সারা বছর পড়াশোনার প্রতি যেমন যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি পরীক্ষার সময়ে খাতার প্রতিও যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যে নিজের পরিচয়টা গুছিয়ে সঠিকভাবে লিখতে হবে। অ্যাডমিট কার্ডের প্রতিটা সংখ্যা বা অক্ষর দেখে তোলার সময় খুব মনসংযোগের সঙ্গে করতে হবে। অনেকে অ্যাডমিট কার্ডটাও আগে থেকে চোখ বুলিয়ে রাখেন যাতে শুরুর এই কাজটা ঝটপট সেরে ফেলা যায়। এ'সব কিছুই পরিষ্কার আর গোটা গোটা হরফে লিখতে হবে। পুরো খাতাতেই এই হাতের লেখা ধরে রাখতে হবে। হাতের লেখা সকলেরই খুব ঝকঝকে, আঁকার মতো হয় না। কিন্তু তা যেন সুস্পষ্ট হয়।

খাতাতে মার্জিন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চারিদিকে পর্যাপ্ত খালি জায়গা ছাড়া উচিত। স্কেল, পেনসিল দিয়ে দাগ না টানতে পারলে খাতা ভাঁজ করে প্রত্যেক পাতায় সমান মার্জিন রাখা উচিত। এই খালি জায়গার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে প্রথমত প্রশ্নের নম্বর লিখতে হয়, পরীক্ষকরা প্রয়োজনীয় নম্বর বা মন্তব্য লেখার জন্যে এই খালি জায়গার ব্যবহার করেন। আর খাতা বাঁধার ফলে যে খাতা মুড়ে যায় তার জন্যেও এই খালি জায়গা দরকারি। একেবারে খাতার কোনা থেকে লিখলে লেখা ভাঁজের মধ্যে ঢুকে যাবে। ফলে খাতা দেখতে অসুবিধা হবে।

প্রশ্নের নম্বর লেখা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবাই সাধারণত খাতার এক পাশে মার্জিনে নম্বর লেখে। কিন্তু এই নম্বর লেখার ধরনটা একটু পালটালে ভালোই হয়। যেমন, একপাশের বদলে নম্বর যদি উত্তর শুরুর আগে খাতার মাঝে একটা বাক্স করে লেখা যায় তো তা খাতার ভাঁজের আড়ালে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আবার পরীক্ষকদেরও খাতা দেখার সময় কোনও প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিটা আলাদা প্রশ্নের মধ্যেও একটা ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত। যাতে প্রশ্নগুলোকে একে-অপরের থেকে আলাদা করা যায়। MCQ-র উত্তর দেওয়ার সময় পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিলে ভালো হয়। প্রতিটা উত্তর যেন আলাদা করে বোঝা যায়। প্রয়োজনে উত্তর শেষে একটা দাগ ছোট করে টেনে দেওয়া যেতে পারে।

কোনও কিছু আঁকার সময় বা গ্রাফের কাজ করার সময়ে পেনসিল খুব তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। একবারে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যাতে মোছামুছির ফলে খাতা নোংরা না হয়ে যায়। সঠিক লেবেলিং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে করা দরকার। স্কেল, কম্পাস যা কিছু উপকরণের ব্যবহার করা যায় তা করে ছবি বা গ্রাফকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর নিখুঁত করতে হবে।

গ্রাফ পেপারে কোনও উত্তর দেওয়ার সময়ে স্কেল নির্বাচন প্রথমে সঠিক হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে অনেকে গ্রাফ পেপারে অঙ্কিত স্কেল ধরেই উত্তর দেন। অনুভূমিক ও উল্লম্ব স্কেলকে প্রশ্ন পড়ে সঠিকভাবে ভাগ করে নিতে হবে। এর ফলে পুরো উত্তর গোটা গ্রাফ পেপার জুড়ে হবে। না হলে ছবিটা পাতার এক কোনায় পড়ে থাকবে। যা দেখতে মোটেই ভালো লাগে না। তাতে উত্তরের স্পষ্টতা আসে না। একই ভাবে সম্পাদ্য, উপপাদ্যেও এই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

ভূগোলের ক্ষেত্রে ম্যাপ পয়েন্টিং আগে থেকে বারে বারে অভ্যেস করতে হবে। এগুলো খাতায় করার সময়ে যেন একদম সঠিক হয়। গোটা ম্যাপটা যেন চোখে ভাসে। কোনও ভাবেই ভুল না হয়।

পরীক্ষার খাতায় দুটো রঙের কালির পেন (সাধারণত কালো আর নীল) ব্যবহার করা যায়। হাইলাইট করলে খাতা যেমন দেখতে সুন্দর লাগে তেমনি স্পষ্টতা বাড়ে।

এসব কিছুর ওপরে হল প্রশ্ন নির্বাচন। যে-প্রশ্নের উত্তরের জটিলতা ছাত্রছাত্রীর কাছে কম বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম সেগুলোয় জোর দিতে হবে। যে-প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণধর্মী তাতে নম্বর কাটার কিছু সম্ভাবনা থাকতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে বিভাজন থাকে তার সবকটি উত্তর দিতে পারলে বেশি নম্বর স্কোর করা যায়।

সবশেষে বলা যায় যে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে খাতার মান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে। হাতের লেখা ও লেখার মান একরকম ধরে রাখতে হবে।

জানো কি?

মানুষের মতো আয়না দেখে নিজেদের চিনতে পারে শিম্পাঞ্জি এবং ডলফিন!

শ্বেত ভালুক কোনওরকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা ৬০ মাইল পর্যন্ত সাঁতার কাটতে পারে!

মাছির গড় আয়ু মাত্র ১৭ দিন।

একটা মানুষের শরীরের সবটুকু রক্ত খেয়ে ফেলতে ১,২০০,০০০টি মশার প্রয়োজন!

ইঁদুর আর ঘোড়া বমি করে না!

একটি মশার ওজন হতে পারে ২.৫ মিলিগ্রাম অর্থাৎ ০.০০২৫ গ্রাম!

কিং কোবরা পৃথিবীর একমাত্র সাপ, যে বাসা বাঁধে।

গোল্ড ফিশ ৩ সেকেন্ডের জন্যে তার স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে পারে।

টাইগার শার্ক-এর বাচ্চারা মায়ের পেটে থাকাকালীন একে অপরের সঙ্গে মারামারি শুরু করে। যেটা বেঁচে থাকে সেটা জন্ম নেয়।

পৃথিবীর সকল মানুষের মোট ওজন, পৃথিবীর সব পিঁপড়ের মোট ওজনের সমান।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পোস্ট অফিস রয়েছে ভারতে।

সুইজারল্যান্ডের মানুষরা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি চকোলেট খায়। গড়ে প্রতিজন চকোলেট খায় বছরে প্রায় ১০ কেজি করে!

আফ্রিকায় অন্য যে কোনও প্রাণীর আক্রমণের চেয়ে জলহস্তীর আক্রমণে বেশি মানুষ মারা যায়!

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রথম পাতার পর

আমরা চাই তারা আমাদের জানাক তাদের কোথায় অসুবিধে হচ্ছে। আমরা সব সময় তাদের পাশে আছি। তবে জানার আগ্রহ তখনই জন্মাবে যখন তারা পাঠ্য পুস্তকটি ভালো করে পড়বে।

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: বিজ্ঞান

তড়িৎপ্রবাহ

আজ আমরা তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে জানব। তোমরা দেখেছ সুইচ টিপলে বাড়িতে আলো জ্বলে, ফ্যান ঘোরে, টিভি চলে, আরও কত কী। এইসব বিদ্যুৎ বা তড়িৎ-এ চলে। আজ আমরা জানব এই তড়িৎ কীভাবে তৈরি হয় আর কীভাবে প্রবাহিত হয়ে এই ধরনের কাজ করে।

উৎস: তড়িৎপ্রবাহের উৎস হল 'সেল' বা কোষ। এরকম একপ্রকার কোষ হল Dry cell বা নির্জল কোষ। একাধিক সেল-এর সমন্বয়ে তৈরি হয় ব্যাটারি। 'সেল'-এ রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই 'সেল'-কে 'প্রাইমারি সেল' বা 'ডিসপোজেবল সেল' বলে। যে কোনও 'সেল'-এর দুটি প্রান্ত হয়। এরা হল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। আরও অনেক প্রকার 'সেল'-এর মধ্যে অন্যতম হল ঘড়িতে ব্যবহৃত বোতাম সেল বা Button cell এবং গাড়িতে ব্যবহৃত সেকেন্ডারি সেল।

পদ্ধতি: একটি সেল-এর দুই প্রান্ত একটি বালবের দুই প্রান্তে যোগ করলে বাল্‌বের মধ্যে দুটি ধাতব তারের মধ্যের যে অংশটি জ্বলে ওঠে তাকে ফিলামেন্ট বলে। সেলের দুই প্রান্তের সঙ্গে বাল্‌বের দুই প্রান্ত যুক্ত করার পদ্ধতি বা ব্যবস্থাকে Circuit বা বর্তনী বলে। বর্তনীতে আরও একটি সেল পাশাপাশি বসালে ফিলামেন্টে তড়িৎপ্রবাহ বাড়ে আর আলো বেশি জোরালো হয়। তড়িৎ সেলের ধনাত্মক দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ফিলামেন্ট-এর মধ্য দিয়ে সেল-এর ঋণাত্মক দিকে পৌঁছয়। একটি বর্তনীর বিভিন্ন অংশগুলি হল-- সেল, সুইচ, তার, বাল্‌ব। সুইচ একটি বর্তনীকে বদ্ধ বা মুক্ত করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ তোমরা সুইচ টিপলে তার দুটি যুক্ত হয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করে ফিলামেন্টে আলো জ্বালায়। সুইচ বন্ধ করলে

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করে। ফলে আলোও নিভে যায়।

তড়িৎপ্রবাহের মাধ্যম: সব পদার্থ তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না। যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে তাদেরকে তড়িৎ সুপরিবাহী বস্তু ও যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না তাদের তড়িৎ কুপরিবাহী বা 'অন্তরক' বলে। কতগুলি তড়িৎ সুপরিবাহী বস্তু হল-- স্টিলের চামচ, লোহার পেরেক, চাবি, জল, তামার তার ইত্যাদি। আর কতগুলি তড়িৎ কুপরিবাহী বস্তু হল কাঠের স্কেল, কাগজের টুকরো, চিনেমাটির কাপ, বায়ু, প্লাস্টিক ইত্যাদি। সুরক্ষিত তড়িৎ পরিবহণের জন্য যে কোনও তড়িৎ পরিবাহীকে তড়িৎ কুপরিবাহী বস্তুর আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা প্রয়োজন, এজন্যই ইলেকট্রিক-এর তার প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা থাকে।

তড়িৎ ক্ষেত্র: তড়িৎপ্রবাহের সময় তড়িৎ পরিবাহীর চারপাশে তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব বিভিন্ন বস্তুর উপর বিভিন্ন রকম। কোনও তড়িৎ ক্ষেত্রে একটি চুম্বক শলাকা আনলে চুম্বকটি নড়ে ওঠে আর চুম্বকটির উত্তর মেরু তড়িৎ প্রবাহের বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে তড়িৎপ্রবাহের ফলে তড়িৎ পরিবাহীর চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হয়।

তড়িৎ চুম্বক: তড়িৎপ্রবাহের ফলে কতগুলি বস্তু নিজে চুম্বকে পরিণত হয়। এজন্যই একটি পেরেকের উপর তার জড়িয়ে সেই তারের দুই প্রান্ত কোনও ব্যাটারির সঙ্গে জুড়লে তা চুম্বকে পরিণত হয়। এই সময় ওই পেরেকটির কাছে অন্য পেরেক আনলে দেখা যাবে যে তার জড়ানো পেরেকটি অন্য পেরেককে আকর্ষণ করছে। এই রকম যে সমস্ত বস্তুতে তড়িৎপ্রবাহের ফলে চৌম্বকত্বের সৃষ্টি হয়, যেমন লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি, সেগুলিকে চৌম্বক পদার্থ বলে। আর তড়িৎপ্রবাহের ফলে এরা চুম্বকে পরিণত হলে এদের তড়িৎ চুম্বক বলে। এরকম তড়িৎ চুম্বক বিভিন্ন প্রকার মোটর, ইঞ্জিন, স্পিকার, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, জেনারেটর, ইলেকট্রিক কলিং বেল, ইলেকট্রিক ক্রেন, টেলিফোন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। চোখে কোনও চৌম্বক পদার্থ যেমন লোহা পড়লে তা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তোলা হয়। এই যন্ত্রে তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার হয়।

অন্যান্য ব্যবহার: কিছু বস্তুতে তড়িৎপ্রবাহের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফলের ব্যবহার আমাদের দৈনিক ব্যবহারের জিনিসে দেখা যায়। যেমন, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি (এতে ব্যবহৃত নাইক্রোম তার গরম হয়ে তাপ উৎপন্ন করে), ফিউজ তার (বৈদ্যুতিক সার্কিট-এর সুরক্ষার জন্য ফিউজ তার ব্যবহৃত হয়। এটি অটোমেটিক সুইচের কাজ করে। ফিউজ তার খুব কম উষ্ণতায় গলে যায় এবং হঠাৎ বর্তনীতে অধিক তড়িৎ এসে পড়লে ফিউজ তার উত্তপ্ত হয়ে গলে গিয়ে বর্তনীকে ভেঙে দিয়ে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করতে সাহায্য করে)।

আবার তড়িতের সাহায্যে আলো উৎপন্ন করে আমরা আমাদের প্রয়োজন মেটাই। যেমন, ইলেকট্রিক বাল্‌ব। এর ফিলামেন্ট তৈরি হয় টাংস্টেন ধাতু দিয়ে। ফিলামেন্ট দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তি আলোকশক্তিতে পরিণত হলে আলোর সৃষ্টি হয়।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: ভূগোল

অধঃক্ষেপণ বা বৃষ্টিপাত

আজকের বিষয় হল বৃষ্টিপাত। মেঘ ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে শুরু করলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে আরও ঘনীভূত হয়। এরপর ছোট ছোট জলকণাগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে বড় জলকণায় পরিণত হয়। বড় জলকণাগুলি বেশি ভারী হওয়ায় বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না এবং তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে বৃষ্টি রূপে ঝরে পড়ে। বাতাসের শীতল হওয়া এবং বাতাসের জলীয় বাষ্প যুক্ত হওয়া, এই দুটি প্রক্রিয়া বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে এবং সেই উষ্ণতায় ওই বায়ুকে সম্পৃক্ত করার জন্য যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রয়োজন— এই দুইয়ের অনুপাতই হল আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ

পরিচলন বৃষ্টি: পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সারাবছর প্রায় লম্বভাবে পড়ে এবং যেখানে জলভাগের পরিমাণ বেশি সেখানে বাষ্পীভবনের পরিমাণ বেশি হয়। এই সমস্ত অঞ্চলের স্থলভাগ ও জলভাগের উপরের বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। এই উষ্ণ বাতাস উপরের দিকে উঠে প্রসারিত হয়। ঊর্ধ্বগামী বায়ুর চাপ কম হয়, উষ্ণতাও কম হয়। কিন্তু জলীয় বাষ্পের পরিমাণ একই থাকায় আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এরপর বাতাস আরও শীতল হয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং ঘনীভূত হয়। এই জলকণা ধূলিকণাকে আশ্রয় করে তৈরি করে মেঘ। পরে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়লে তাকে বলা হয় পরিচলন বৃষ্টিপাত। দুপুরের পর বা বিকালের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

পরিচলন বৃষ্টি প্রভাবিত অঞ্চলগুলি হল— (ক) নিরক্ষীয় অঞ্চল, (খ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে গরম কালের শুরুতে এই বৃষ্টিপাত দেখা যায়। (গ) ক্রান্তীয় মণ্ডলে মৌসুমি বায়ু অধ্যুষিত দেশ যেমন, ভারত, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, মায়ানমারে মৌসুমি বায়ু আসার আগে এবং শরৎকালে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত: সমুদ্র থেকে আগত জলীয়বাষ্প পূর্ণ আর্দ্র বায়ুর প্রবাহপথে আড়াআড়ি ভাবে কোনও পর্বত বা উচ্চভূমি থাকলে, ওই বায়ু পর্বত বা উচ্চভূমিতে বাধা খেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এরপর এই বায়ু ক্রমশ প্রসারিত ও ঠান্ডা হয় এবং আরও উপরে উঠে সম্পৃক্ত ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়, যা শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত নামে পরিচিত। পর্বতের যে ঢাল বরাবর বায়ু উপরের দিকে ওঠে ও বৃষ্টিপাত ঘটায়, সেই ঢালকে বলা হয় প্রতিবাত ঢাল। আর যে ঢাল বরাবর বায়ু নীচের দিকে নামে তাকে বলা হয় অনুবাত ঢাল।

প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর বায়ু যখন পর্বতের অনুবাত ঢালে পৌঁছয়, সেই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। এরপর বায়ু যত নীচের দিকে নামতে শুরু করে তার উষ্ণতা তত বাড়তে থাকে এবং জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে বায়ু অসম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিবাত ঢাল অপেক্ষা অনুবাত ঢালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়, তাই পর্বতের আনুবাত ঢাল বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে পরিচিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আরব সাগরীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পেয়ে পর্বতের পশ্চিম ঢালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ু যখন পর্বতের পূর্ব ঢালে পৌঁছয়, তখন এতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। তাই পূর্ব ঢালে অবস্থিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশ বিশেষ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

ঘূর্ণবৃষ্টি: স্বল্প পরিসর কোনও স্থানে উষ্ণতা বেড়ে গেলে সেখানকার বায়ু গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, ফলে সেখানে বায়ুর চাপ কমে গিয়ে গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রর সৃষ্টি হয়। উচ্চচাপ অঞ্চলের বায়ু প্রবল গতিতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসায় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রাভিমুখী ঊর্ধ্বগামী বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মুষলধারে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই ঘূর্ণবাতসৃষ্ট বৃষ্টিপাতের নাম ঘূর্ণবৃষ্টি। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন, ক্যারিবিয়ান সাগরে হ্যারিকেন, পূর্ব চিন সাগরে টাইফুন নামে পরিচিত।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত প্রভাবিত অঞ্চল: উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু যেখানে মিলিত হয় সেখানে ঘূর্ণবৃষ্টি হয়। এছাড়া মৌসুমি বায়ু অধ্যুষিত দেশগুলিতে বছরে বিশেষ সময় ঘূর্ণবৃষ্টি হতে দেখা যায়।

আরও কয়েক প্রকার অধঃক্ষেপণ হল গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি (জলকণার ব্যাস ০.৫ মিমি-এর কম), স্লিট (জলকণা ও তুষারকণার মিশ্রণ), শিলাবৃষ্টি (বেশি উচ্চতায় অনেক জলকণা একসঙ্গে বরফ হয়ে ঘটায়) ও তুষারপাত (হিমাঙ্কের থেকে কম উষ্ণতায় বাষ্প জলকণার বদলে সরাসরি বরফে পরিণত হয়ে ঝরে পড়ে)।

রেনগজের সাহায্যে বৃষ্টিপাত মাপা হয়।

পৃথিবীর যেসব জায়গায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান, সেইসব স্থানকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়। একে বলা হয় সমবর্ষণ রেখা।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ইতিহাস

বাস্তিলের পতন

এই টিউশনে আজ আমরা স্টেটস জেনারেল নিয়ে রাজার সঙ্গে জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিনদের সংঘাত নিয়ে আলোচনা করব।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে দীর্ঘ ১৭৫ বছর পর দেশের অর্থসংকট মেটাতে ও অভিজাতদের চাপে ষোড়শ লুই ফরাসি জাতীয়সভার অধিবেশন স্টেটস জেনারেল-এর অধিবেশন ডাকেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, এই সভায় যাজক (৩০৮ জন), অভিজাত (২৮৫ জন) ও তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ (৬২১ জন) অংশ গ্রহণ করেছিল। ভোটব্যবস্থাও ছিল সম্প্রদায় পিছু, মাথা পিছু না। যাজক আর অভিজাতরা মিলিত ভাবে ভোট দিত দুটি, আর তৃতীয় সম্প্রদায় মিলে ভোট দিত একটি। প্রত্যেকবার এই ভোটে প্রথম দুই শ্রেণির জয় হত। তাই এই অধিবেশনে তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ফ্রান্সের জিরন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব বাঁধে। তাদের দাবি ছিল তাদের এক কক্ষে বসতে দিতে হবে এবং মাথা পিছু ভোটের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এদের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিরাব্যুঁ, লাফায়ে, আবেসিয়েস, রোবসপিয় প্রমুখ। যথারীতি রাজা ষোড়শ লুই, যাজক ও অভিজাতরা এই দাবি মানতে চাননি। এই তৃতীয় সম্প্রদায় বিপ্লবাত্মক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে জাতীয় সভা ঘোষণা করে যা ছিল আইন বিরোধী। ফলে রাজা তা মানেননি।

টেনিস কোর্টের শপথ: ১৭৮৯ সালের ২০ জুন তৃতীয় সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট ঘরে সভার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু রাজা সেই কক্ষ বন্ধ করে রাখেন সভা ভেস্তে দেওয়ার জন্য। এতে ক্ষুব্ধ জনগণ মিরাব্যুঁ ও অ্যাবসিয়েসেয়ার নেতৃত্বে এক টেনিস মাঠে জমায়েত হয়ে শপথ নেন যে ফ্রান্সের নতুন সংবিধানে তাদের অধিবেশনের কথা উল্লেখ করতে হবে এবং তারা যে স্থানেই সভা করুক না কেন, তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এই শপথ 'টেনিস কোর্টের শপথ' বলে বিখ্যাত। ১৩৯ জন যাজকের মধ্যে ৪৭ জন এই আন্দোলনে শামিল হন। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে রাজা সব দাবি মেনে নেন।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ফল বস্তিল দুর্গের পতন: বাস্তিল দুর্গ ছিল এমন এক কারাগার যেখানে নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেওয়া হত। রাজা ষোড়শ লুই বুর্জোয়াদের দাবি মেনে নেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের দাবিয়ে রাখার জন্য তিনি প্যারিস ও ভার্সাই-এ সৈন্য মোতায়েন করেন আর জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করেন। এতে অসন্তোষ আরও বাড়ে। আশেপাশের গ্রামের মানুষ প্যারিসে এসে বিদ্রোহে যোগ দেন। সর্বহারা মানুষরা অস্ত্রের দোকান লুট করে ব্যারিকেড করে এবং এই সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে বন্দিদের মুক্ত করে। এই দুর্গ ছিল রাজার স্বৈরাচারিতার চরম নিদর্শন। এর পতনে অভিজাতরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের দিন শেষ। প্যারিসের শাসনভার বুর্জোয়ারা নিজের হাতে তুলে নেন। তারা প্যারিস কমিউন গঠন করে পৌর শাসনব্যবস্থা চালু করে, এতে প্যারিসের শাসনব্যবস্থা নতুন করে গঠিত হয় এবং লাফায়েতের নেতৃত্বে নতুন জাতীয় রক্ষাবাহিনী গঠিত হয়। ফ্রান্সও এর দেখাদেখি ফ্রেঞ্চ কমিউন গঠন করে। ইতিহাসে এই বিপ্লব এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। ঐতিহাসিক গুডউইন তাঁর ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন গ্রন্থে বলেছেন, বিপ্লবে বাস্তিলের পতনের মতো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী ঘটনা আর ঘটেনি। এই প্রতিবাদ ইঙ্গিত দেয় যে রাজার একক শাসন আর কার্যকরী নয়। রাজা বুঝতে পারেন প্যারিসে তাঁর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

প্যারি কমিউন: প্যারিস নগরী বরাবরই বিদ্রোহের জন্য ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে। এখানে প্রজাতন্ত্রের একাধিপত্য ছিল। তাদের ধারণা ছিল প্যারিসই ফ্রান্সের যোগ্য রাজধানী। কিন্তু সরকার ভার্সাই শহরকে রাজধানী বানালে প্যারিসের আত্মসম্মানে লাগে, তারা ভয় পায় রাজতন্ত্রবাদী ভার্সাইদের জন্যে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র না ফিরে আসে। জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্যারিসের প্রতিটি মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত খাদ্যাভাবে প্যারিস হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্যারিস বঞ্চিত হয় রাজধানী হওয়ার থেকে। এতে প্যারিসের ব্যবসায়ীদের ভয় হয় যে ভার্সাইদের সঙ্গে পাল্লায় তাঁরা পারবেন না। ফলে তাঁরা সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা না রেখে তা ভাগ করে দিতে চান। তাঁরা দাবি করেন প্রতি অঞ্চলে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে যাদের নিয়ে কমিউন গঠন করা হবে। এঁরা স্থানীয় শাসন দেখাশোনা করবেন। এই কমিউনের প্রতিনিধি সরকার গঠন করবেন। ৯০জন প্রতিনিধি নিয়ে প্রথমবার এই প্যারি কমিউন গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতি থ্রিয়ার্স প্রথম জাতিকে আশ্বস্ত করেন যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হয়েছে। প্যারি কমিউনের বিদ্রোহ দমন না করা হলে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য ভেঙে পরবে। পরে তিনি সেনাপতি ম্যাকমেহনকে নিয়োগ করেন বিদ্রোহ দমন করার জন্য। তিন সপ্তাহের যুদ্ধে তিনি প্যারিস কবজা করেন। শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রীদের দমন করে বুর্জোয়াদের জয় হয়।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ইতিহাস

উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম সংস্কার আন্দোলন

আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। ধর্মীয় আড়ম্বর, যাগযজ্ঞ, পশুবলি, মূর্তিপুজো এগুলির বিরোধিতা করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

ব্রাহ্ম আন্দোলন: উনিশ শতকে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে যারা উদ্যোগী হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ব্রাহ্মসমাজ। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ নাম বদলে কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ নাম রাখা হয়। এখানে মূলত ব্রাহ্মসংগীত, বেদ ও উপনিষদ নিয়ে আলোচনা হতো। ধীরে ধীরে মতভেদ শুরু হওয়ার ফলে ব্রাহ্মসমাজের বিভাজন শুরু হয়। গড়ে ওঠে ধর্মসভা, যার সভাপতি ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক রাধাকান্ত দেব। এরপর বিতর্ক ও মতামত প্রকাশের জন্য প্রাচীনপন্থীরা 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে রামমোহন 'সংবাদ কৌমুদী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র রূপে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

বৈশিষ্ট্য ও বিভাজন: ১৮৫০ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিবর্তনের সময়কালে বিভাজনের মুখে এসে ব্রাহ্মসমাজে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে সংস্কারের থেকে সমাজসেবা ও সমাজের নানা সমস্যার সমাধানে জোর দেওয়া হয়। যুক্তিবাদী ধর্মনির্ভর আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজে প্রবাহিত হয়। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজে নতুন শক্তির সঞ্চার করেন। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের সমর্থন, মদ্যপান ও বহুবিবাহের নিন্দা এবং ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনায় নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলা হয়। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের বিবর্তন বিভাজনের দিকে মোড় নেয়। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনের রূপ নেয়।

দেবেন্দ্রনাথের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় কেশবচন্দ্র সেনকে আচার্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে আনুগামীদের নিয়ে তিনি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দির, মসজিদ, গির্জার সমন্বয় ঘটাতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির' গঠন করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের স্বীকৃতি এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। ব্রাহ্মসমাজ বিভাজিত হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ', যার কর্ণধার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ', যার কর্ণধার ছিলেন কেশব সেন এই দু'ভাগে ভাগ হয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন নতুন ভাবধারা নিয়ে 'নববিধান' সমাজ গঠন করেন।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে ব্রাহ্ম আন্দোলন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ব্রাহ্ম আন্দোলনে একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্বে মূর্তিপুজো, যাগযজ্ঞ, পশুবলি বা ধর্মীয় আড়ম্বর ছিল না।

রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়: সামাজিক গোঁড়ামি ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রভাব সংস্কার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। হিন্দু হয়েও তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তাকে কেউ খ্রিস্ট, কেউ কৃষ্ণ, কেউ আল্লা বলে ডাকলেও এবং তাদের মত ও পথ আলাদা হলেও, লক্ষ্য কিন্তু একই।' স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বলরাম বসু, গিরীশ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ রামকৃষ্ণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান বাণী ছিল, 'যত মত তত পথ'।

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কার: ভারতের চিরাচরিত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধর্মচিন্তার প্রবর্তন করেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ -১৯০২)। তিনি মানুষ গড়ার ধর্ম (Man Making Religion) ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে, ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগোতে কলম্বাস হলে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে প্রাচ্য সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করতেন, স্বদেশ ও সমাজ সেবার মাধ্যমে দরিদ্র নারায়ণকে সেবা করা যায়। তাঁর পরামর্শ ছিল 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' একদিকে যেমন সহিষ্ণুতার পথ দেখিয়েছে, অন্যদিকে তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশ প্রেম, শিক্ষা সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তিনি বেলুড়ে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাংলার নবজাগরণের চরিত্র ও পর্যালোচনা: বাংলার বৈপ্লবিক নবজাগরণের ফলে সারা ভারতেই সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেই এক নব জোয়ার এসেছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুর লেখনীতে সার্থক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল।

বাংলার নবজাগরণ ধারণার ব্যবহার বিষয়ক বিতর্ক: উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি ও চিন্তার জগতে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে, অনেকে তাকে নবজাগরণ আখ্যা দিতে রাজি নন। ইতিহাসবিদ অশোক মিত্র একে 'তথাকথিত নবজাগরণ' বলেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নবজাগরণের কর্ণধার বলা হয় তিনটি মূল সূত্র থেকে। (১) কর্ণওয়ালিস-এর ভূমি-রাজস্ব নীতি (২) ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থবাহী বাণিজ্য এবং (৩) কোম্পানির সরকারের নানা দপ্তরে সীমিত সুযোগপ্রাপ্ত চাকুরেশ্রেণি।

মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক ড. রজনীপাম দত্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে উনিশ শতকের নবজাগরণের পৃষ্ঠপোষকদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, বিদিশা চক্রবর্তী**

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ **'আমার স্কুল'** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMAR SCHOOL'
মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা 'রোল নং ওয়ান' বিভাগে যোগ দিতে পারো।

ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা), ই-মেইল: jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ইতিহাস: ব্রিটিশদের নিন্দনীয় কাজের মধ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী ক্ষোভের আগুনকে আরও উসকে দিয়েছিল। এই ঘটনাটি ঘটেছিল পঞ্জাবে। পঞ্জাবের হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তাদের দুই শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে অমৃতসরের কাছে জালিয়ানওয়ালাবাগের এক মাঠে একটা প্রতিবাদী সভার আয়োজন করেছিল এবং জমায়েত হয়েছিল। যদিও পুলিশ আগের থেকেই সভায় কার্ফু জারি করেছিল। এর মধ্যে সভা চলাকালীন অমৃতসরের সামরিক শাসনকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এডওয়ার্ড হ্যারি ডায়ার তার বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেই সভাস্থলটি চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলে এবং কোনওরকম সতর্কতা জারি না করেই এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায়। এই গুলি বর্ষণে বহু শিশু, বৃদ্ধ, নারী, যুবক মারা যায় আর জখম হয়। সরকারি হিসাবে মারা যায় ৩৭৯ জন এবং জখম হয় ১,২০০ জন। যদিও বেসরকারি সূত্রে এই হিসাব অনেকটাই বেশি, তাদের মতে মৃতের সংখ্যাই হাজার। সারা দেশ এই আচমকা হত্যাকাণ্ডের খবরে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

কেন এই ষড়যন্ত্র: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সৈন্য ও সম্পত্তি দিয়ে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। সেই সময় প্রায় ১.২৫ মিলিয়ন যোদ্ধা ব্রিটিশদের স্বার্থে ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে ৪৩০০০ ভারতীয় যোদ্ধা সেই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। সাধারণভাবে যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ বিরোধী এক ধরনের মনোভাব ভারতীয়দের মধ্যে কাজ করতে থাকে। এককথায় বলা যায় ভারতবাসী এই ৪৩,০০০ প্রাণের জন্য ভিতর ভিতর তড়পাতে থাকে। ব্রিটিশরা সেই ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করে তারাও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই সূত্রে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট বিদ্রোহ ভারতে ইতস্তত হয়। এর মধ্যে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক বিদ্রোহ হয় যা ঘাদাব বিদ্রোহ নামে পরিচিত যেটা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বিস্তৃত। এই বিদ্রোহ ভারতীয় জাতিয়তাবাদী, রাশিয়ান সোশালিস্ট, আমেরিকান এবং জার্মানির সমর্থন নিয়ে সঙ্ঘটিত হলেও ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের তৎপরতায় দমন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এই বিদ্রোহ বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব হিসাবে প্রচুর পরিমাণে মানুষের মৃত্যু, ট্যাক্স বৃদ্ধির মাধ্যমে অসামান্য আর্থিক চাপ, সামলে দেওয়ার চেষ্টার ফলে দেশের মূল্যবৃদ্ধি, তার সাথে হু হু করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে মহামারী, আর ব্যবসা-বাণিজ্যের চরম হারে ক্ষতি ভারতের অর্থনীতির ভিতকে তো দুর্বল করেই ছিল সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও ভারসাম্যহীন করে দিয়েছিল। এদিকে ব্রিটিশদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার সহ্য করতে করতে ভারত তখন স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। যেসব ভারতীয়রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের অনেকেই সেই সময় চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে অস্ত্র নিয়ে আসে। যুদ্ধের আগে যে ধরনের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখা গিয়েছিল কংগ্রেসের কট্টরপন্থী ও আধুনিক গুরুত্বগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরে সেই জাতীয়তাবাদী মনোভাব আবার জেগে ওঠে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকত এই বুঝি আবার বিদ্রোহ লাগে। যদিও অমৃতসরের কাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধানকারীরা এই ধরনের কোনও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায়নি। কিন্তু জেনারেল ডায়ার মনে করতেন ভারতীয়দের যদি একটা জোরদার ধাক্কা দেওয়া যায় তাহলে তারা হয়তো কিছুটা দমে থাকবে। যদিও তিনি ব্রিটেনে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং সন্ত্রাসী হামলার জন্য অভিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালের বিদ্রোহের স্মৃতি ব্রিটিশদের যথেষ্ট ঘাবড়ে দিয়েছিল। ঠিক তখনই রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের বার্তা ভারতেও ছড়িয়ে পড়ায় ব্রিটিশরা আরও চাপে পড়ে যায়।

সেই অন্ধকার দিন: ১৩ এপ্রিল শিখদের বৈশাখী উৎসবের দিন অসংখ্য হিন্দু ও মুসলিম জনতা অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠে জমায়েত হয়। সভা শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা পরে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটার দিকে অমৃতসরের সামরিক কমান্ডার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে ৬৫ সদস্যের এক গুর্খা ও ২৫ বেলুচি যোদ্ধা সভাস্থলে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে ৫০ জন লি এনফিল্ড ৩০৩ নিয়ে এসেছিল যা সেই সময়ের এক রাইফেল। অন্যদিকে দায়ার দুটো মেশিনগান যুক্ত আর্মার্ড গাড়ি নিয়ে আসে। গাড়িগুলো মাঠের প্রবেশপথে এমনভাবে রাখা হয় যাতে ভিতরের কেউ সেই রাস্তা দিয়ে বেরোতে না পারে। মাঠটা ছিল সব দিক থেকে বাড়ি আর সরু রাস্তা দিয়ে ঘেরা। ডায়ার সেখানে এসে কোনওরকম সতর্কতা ছাড়াই তার বাহিনীকে গুলি চালানোর আদেশ দেয়। পরে অবশ্য দায়ার বলেছিলেন তখন কোনও সংকেত দেওয়ার সময় তার কাছে ছিল না। তখন ছিল ভারতীয়দের শাস্তি দেওয়ার সময়। প্রায় দশ মিনিট ধরে এমন এলোপাথাড়ি গুলি চলে। গুলি তখনই বন্ধ করা হয় যখন সাপ্লাই প্রায় শেষ হয়ে যায়। এই সময় প্রায় ১,৬৫০ রাউন্ড গুলি খরচ করা হয়।

প্রতিবাদমুখর দেশবাসী: এই ঘটনার ঠিক পরেই এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সারা ভারত জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিদ্বজনেরা ও ভারতের আরও উঁচু শ্রেণির জাতীয় নেতারা এই ঘটনার চরমভাবে সমালোচনা করেন।

পরবর্তী ঘটনাসমূহ: দেশজুড়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ায় জনগণের চাপে ব্রিটিশ সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত শেষে ঘোষণা করা হয় এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে মারা গেছে মাত্র ৩৭৯ জন আর জখম হয়েছে এক হাজার একশো জন। সেদিনই জাতীয় কংগ্রেস দাবি করে মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তৎকালীন সিভিল সার্জন ড. স্মিথ জানান এই হত্যাকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা এক হাজার পাঁচশ ছাব্বিশ জন। এই ঘটনার পরপরই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে অপসারণ করা হয় তার পদ থেকে। তাকে লন্ডনে ফিরে যেতে বলা হয়। কিন্তু প্রতিশোধের আগুন শিখদের মধ্যে জ্বলতেই থাকে। এই কাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক শিখ যুবক লন্ডনে গিয়ে ডায়ারকে গুলি করে হত্যা করে। ডায়ার তখন লন্ডনে ক্যাকস্টন হলে একটি অনুষ্ঠানে ভাষন দিচ্ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের এই পাশবিক আচরণের প্রশ্রয় দেওয়াকে ধিক্কার জানানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ তার সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ‘জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস ঘটনা সারা দেশে মহাযুদ্ধের হোমশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল’।

১৯১৯ সালের তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকারের এমন অমানবিক আচরণের জন্য ২০১৩ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন দুঃখ প্রকাশ করেন। গণহত্যার জন্য ব্রিটেনার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই প্রথম কোনও ব্রিটেন শাসনকর্তা দুঃখ প্রকাশ করল। প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারতে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরের শেষ দিনে ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসরে গণহত্যার স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে প্রার্থনা করে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন ক্যামেরন। ওই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্যামেরন বলেন, এই ঘটনা ব্রিটেনের ইতিহাসে সবথেকে লজ্জাজনক ঘটনা। এতদিন পরেও মানুষের মন থেকে এই দাগ মুছে যায়নি।

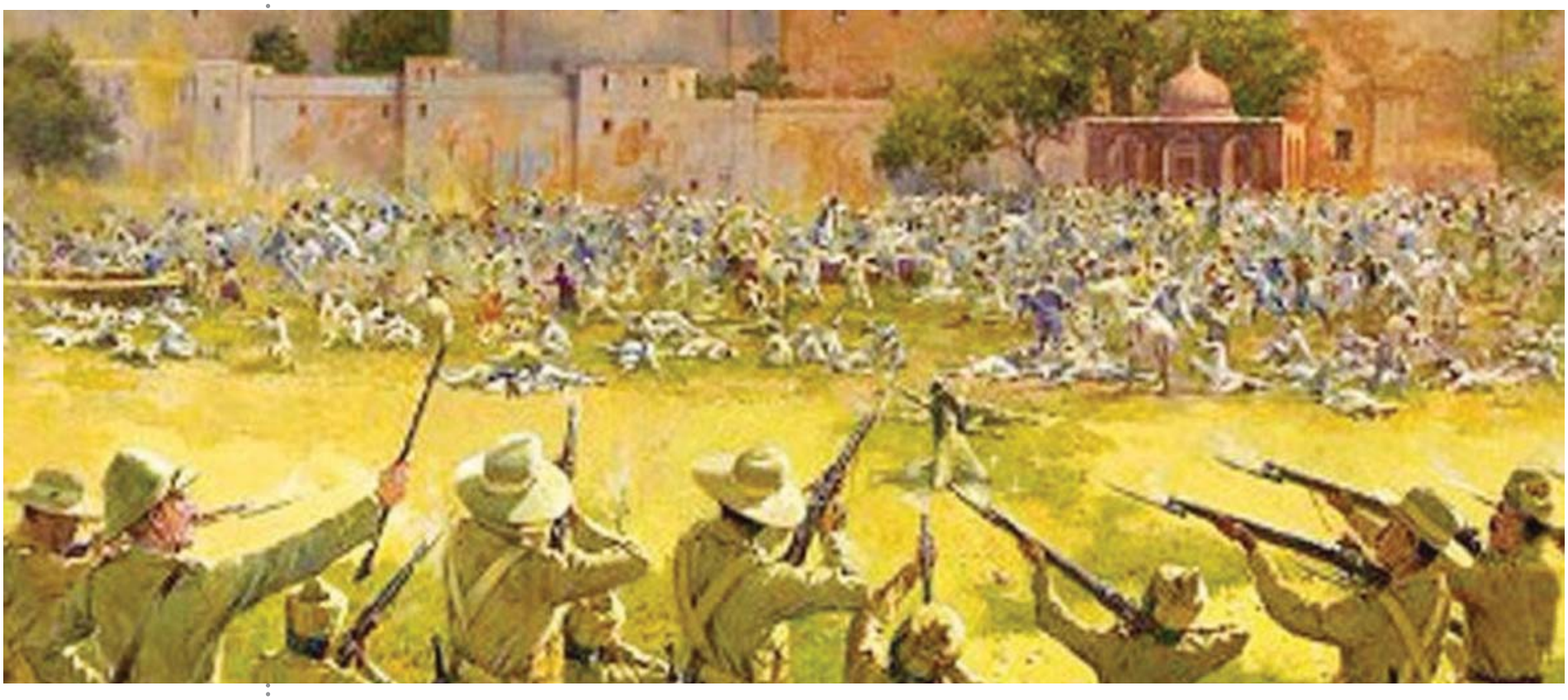

উত্তরণ
জেনারেল নলেজ
তোমাদের কেমন লাগছে, মেল করে জানাও আমাদের

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

ক্যুইজ

১) আধুনিক মানুষের উৎপত্তি কোন যুগে?
২) একটি জিন অপর কোনও জিনের প্রকাশকে বাধা দিলে তাকে কী বলে?
৩) সাধারণত বর্ণান্ধ ব্যক্তিরা কোন রং চিনতে পারেন না?
৪) ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিনকে কী বলে?
৫) কোন ধরনের কোষ বিভাজনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে?
৬) কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি কাকে বলে?
৭) জিনগত তারতম্য ঘটিয়ে যে নতুন জীব সৃষ্টি করা হয়,তাদের কী বলে?
৮) প্যারিস গ্রিন কীটনাশক ব্যবহারে কী দূষণ বাড়ে?
৯) কায়িক পরিশ্রমকারীদের কী জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করা উচিত?
১০) গিনিপিগ কোন বর্গের প্রাণী?
১১) চোখের লেন্সে কোন প্রোটিন থাকে?
১২) গাপ্পি, গাম্বুসিয়া মাছগুলি ভারতে আমদানির কারণ কী?
১৩) ক্রেবস চক্রের বিক্রিয়া কোথায় ঘটে?
১৪) জীবের মৃত্যুতে দায়ী জিনকে কী বলে?
১৫) মানবদেহের ছোট কোষ কী?
১৬) টাইগার মসকুইটো কাকে বলে?
১৭) কোন উদ্ভিদের চোষক মূল আছে?
১৮) ক্লোরোফিল যুক্ত মূল পাওয়া যায় কোন গাছে?
১৯) 'সালোকসংশ্লেষের অন্ধকার দশা' কে আবিষ্কার করেন?
২০) জীবদেহের খণ্ড অংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ দেহসৃষ্টির পদ্ধতিকে কী বলে?
২১) চোয়ালবিহীন একটি প্রাণীর নাম কী?
২২) বহুসংখ্যক বীজপত্র রয়েছে কোন বীজে?
২৩) উদ্ভিদের বর্ষবলয় গঠিত হয় কী থেকে?
২৪) মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিণাম বাড়ায় কোন শৈবাল?
২৫) উদ্ভিদ কোষের প্লাস্টিড আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানী?
২৬) পাখির ডানা ও পতঙ্গের ডানা পরস্পর কী ধরনের অঙ্গ?
২৭) প্রথম জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন কে?
২৮) কোন শ্রেণির প্রাণীর দেহে সরলতম হৃৎপিণ্ড আছে?
২৯) রেসারপিন কোন গাছের উপক্ষার?
৩০) কোন গাছের ছালের নীচের রস থেকে রাবার তৈরি হয়?
৩১) জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড আসলে কী?
৩২) বাষ্পমোচনের হার পরিমাপের যন্ত্রের নাম কী?
৩৩) পাপড়ির ফুটে ওঠা কী ধরনের চলন?

৩৪) মানুষের মেরুদণ্ডে অস্থির সংখ্যা কটি?
৩৫) কোন সবজিতে র‍্যাসফাইড পাওয়া যায়?
৩৬) কোন যন্ত্রের সাহায্যে জলের নীচের তল দেখা যায়?
৩৭) লেন্স পরিমাপের যন্ত্রের নাম কী?
৩৮) চাপের পরিবর্তন পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?
৩৯) কোন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার পরিমাপ করা যায়?
৪০) স্কার্ভি রোগ কী কারণে হয়?

উত্তর: ১) সিনোজোয়িক যুগে। ২) এপিস্ট্যাসিস। ৩) লাল ও সবুজ। ৪) অঙ্কোজিন। ৫) মিয়োসিস। ৬) রাইবোজোমকে। ৭) ট্রান্সজেনিক জীব। ৮) আর্সেনিক দূষণ। ৯) প্রোটিন। ১০) Rodensia. ১১) ক্রিস্টালিন। ১২) মশার লার্ভা দমন। ১৩) মাইটোকন্ড্রিয়ার স্ট্রোমায়। ১৪) লিথাল জিন। ১৫) লিম্ফোসাইট। ১৬) এডিস মশাকে। ১৭) স্বর্ণলতা। ১৮) পানিফল। ১৯) বিজ্ঞানী ব্ল্যাকম্যান। ২০) পুনরুপাদন। ২১) হ্যাগফিস। ২২) Pinus. ২৩) গৌণ জাইলেম। ২৪) Nostoc. ২৫) বিজ্ঞানী স্কিমপার। ২৬) সমবৃত্তি অঙ্গ। ২৭) জেনোফেন। ২৮) মাছ। ২৯) সর্পগন্ধা। ৩০) প্যারা রাবার। ৩১) এক অতি উন্নতমানের এরেনকাইমা। ৩২) গ্যানং পোটোমিটার। ৩৩) ফোটোন্যাস্টি। ৩৪) ৩৩টি। ৩৫) কচু, ওল। ৩৬) হাইড্রোস্কোপ। ৩৭) ফ্যাকোমিটার। ৩৮) টেসিমিটার। ৩৯) হাইগ্রোমিটার। ৪০) ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে।

এডু অ্যাডভাইস

ছাত্রজীবনে বিপর্যয় মোকাবিলা

তনুশ্রী দাস

'বিপর্যয় মোকাবিলা' কথাটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে হওয়া বিপর্যয় বোঝাতেই একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত হয়। ছাত্র জীবনেও নানারকম বিপর্যয় হয় বই কী। বিপর্যয় মানেই তো স্বাভাবিক অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষতি হয় তাকেই বোঝায়। ছাত্র জীবনে নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব সবথেকে বেশি। রুটিন করে চলা সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। তাই বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা আমাদের জীবনকে একটা নিয়মে বাঁধতে চান। সময়ে ঘুম থেকে ওঠা, নিয়মিত স্কুলে যাওয়া, নিয়ম করে বাড়ির কাজ বা হোম ওয়ার্ক সেরে ফেলা, আর রোজকার পড়া রোজ সময়মতো করে নেওয়া। আমরা সবাই কম-বেশি তাই করি। ফলে আমাদের পিছিয়ে পড়ার ভয় থাকে না। এবং স্কুলে যে নানারকম পরীক্ষা চলে, প্রোজেক্টের চাপ থাকে তাদের সামলাতে আমাদের খুব একটা হিমশিম খেতে হয় না। কিন্তু সমস্যা হয় যখন হঠাৎ কোনও বিশেষ কারণে আমাদের এই রুটিন বা ছক ভেঙে যায়।

কোনও অনুষ্ঠান, উৎসব বা অন্য যে কোনও পূর্বপরিকল্পিত কারণে পড়াশোনার দৈনিক রুটিন ভাঙতে হলে আমরা আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়েই রাখি। কিন্তু সমস্যা হয় শারীরিক কোনও সমস্যায়। সাধারণত অসুখ বলে-কয়ে আসে না। ফলে হঠাৎই এই বিপর্যয় নামে। বাড়াবাড়ি হলে দিন কয়েক রোজকার স্কুল, প্রাইভেট টিউশন, বাড়ির পড়া সব ভেস্তে যেতে পারে। ফলে হোম ওয়ার্কের চাপ, প্রাইভেট টিউশনের প্র্যাকটিস ও নোট তৈরিতে পিছিয়ে যেতে হয়। শরীরে রেশ রয়ে যাওয়া দুর্বলতার কারণে আগের দমে কাজে ফিরতে বেশ কিছুটা সময়ও যায়। ফলে এই ক্ষতি মিটিয়ে নিতেও সময় লাগে। কিন্তু রোজকার স্কুল, পড়া তো চলতেই থাকে। ফলে পিছিয়ে পড়া অংশের সঙ্গে নতুনের একটা চাপ এসে পড়ে।

এই রকম পরিস্থিতিতে যে কোনও ছাত্র-ছাত্রীর মূল সমস্যা যেটা হয় যে সে নাজেহাল হয়ে পড়ে, ঘাবড়ে যায়, দুশ্চিন্তা করতে থাকে। এটাই সব থেকে বড় ভুল। উলটে বলা যায় এমন দিন কয়েকের ছুটি তো এমনি পাওয়া যায় না। এমনকী পরীক্ষার পরেও আমাদের নিস্তার নেই। পরের ক্লাসের পড়া এগিয়ে রাখা, অঙ্কের অভ্যেস চালিয়ে যাওয়া, এমনকী বাড়ির শিক্ষকরাও হুড়মুড়িয়ে পড়া শুরু করে দেন। এই সবের কারণে নির্ভেজাল ছুটির কথা আমরা ভুলতেই বসেছি। তাই এই অবসরে উচিত নাক ডাকিয়ে ঘুমানো, ভালো-মন্দ খাওয়া আর সকলের আদর ভোগ করা।

বড়রা হয়তো এসব কথা শুনলে চোখ রাঙাতেও পারেন। কিন্তু পরিস্থিতি নিরুপায়। তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। অযথা উদ্বেগ, কম ঘুম, অপরিমিত খাওয়া-দাওয়া, এমনকী ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও চলা উচিত না। তাঁর অনুমতি ছাড়া স্বাভাবিক পড়াশোনার রুটিনে ফেরার চেষ্টা করলে উলটে বিপত্তি হতে পারে। ছুটির দিন বাড়াতে হতে পারে। তাই এই সব সময়ে শরীরের ওপরে খবরদারি না করাই ভালো।

উলটে যা যা করা হয় না অথচ করা উচিত যেমন, ভালো গান শোনা, ভালো সিনেমা দেখা, ভালো গল্পের বই পড়া, বা গল্প শোনা— এসব করা যেতে পারে। কিন্তু বেশি টিভি দেখা বা শিক্ষামূলক ছাড়া অন্য অনুষ্ঠান দেখা, মোবাইলে গেম খেলা ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর বিনোদন শারীরিক অস্বস্তি বাড়াবে। মাথা ধরা, চোখ জ্বালা ইত্যাদি সমস্যা থেকেই যাবে। সকাল-বিকেল বারান্দা বা উঠোনে না হলে নেহাত ঘরে একটু পায়চারি করা গেলে শরীর, মন ভালো লাগবে।

এ তো গেল তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কথা। এবার অসুখ শেষে যে জটিল অবস্থা তৈরি হয়, তা নিয়েও কিছু ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে। প্রথমে অসুস্থ হওয়া মাত্র বন্ধুবান্ধবদের জানানো উচিত। মাঝে মাঝেই খোঁজখবর করা উচিত। স্কুলে কী হচ্ছে তা যেন জানা থাকে। আবার স্কুলে নতুন কোনও নোটিস দেওয়া হলে তাও তাদের কাছ থেকেই জানা যাবে। এই ব্যাপারে অভিভাবকরা অবশ্যই সাহায্য করবেন। নতুন করে পড়াশোনা শুরু করা মাত্র কী কী তুমি করতে পারনি সেগুলো রুটিন অনুসরণ করে জেনে নেওয়া দরকার। যাতে কিছু নজর এড়িয়ে না যায়। নোটস লেখার জন্যে মা-বাবার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ফলে নিজের ওপর ধকল কম পড়ে। আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অসুবিধা হয় না। যে কোনও বিষয় যা তুমি ক্লাসে বুঝে নিতে পারোনি তা না বুঝলে জিজ্ঞেস করে নিতে দ্বিধা কোরো না। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুপস্থিতির সঠিক কারণ ও তোমার ফিটনেস সার্টিফিকেট জমা দিতে তুমি বাধ্য। স্কুলের এই সমস্ত নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চললে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায়। আর প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে পড়া এগিয়ে রাখার কথা তো সব সময়ে বলা হয়। যারা এটি করে তাদের খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয় না।

সন্তান মিথ্যে বলছে?

প্রথম পাতার পর

দেখবেন নিজের অজান্তে এমন কোনও কাজ করবেন না, যাতে আপনার সন্তানের জন্য তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এই ব্যাপারে বিশিষ্ট মনোস্তত্ত্ববিদ দোলা মজুমদারের মতে, বাবা-মা যখনই জানতে পারবেন যে তার সন্তানের মিথ্যে কথা বলার প্রবণতা হচ্ছে, তখনই এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। অর্থাৎ তাকে বুঝিয়ে বলা উচিত সে যে কাজটি করছে সেটি ভুল। এটি করা তার ঠিক নয়। তবে এই বোঝানোর ব্যাপারটি যেন কখনোই নেতিবাচকভাবে না হয়। তাকে বকাঝকা দিয়ে মারধর করে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। এই সমস্ত বিষয়ে সবসময় পজিটিভভাবে বোঝানো উচিত। পাশাপাশি তিনি জানান, এই ধরনের প্রবণতা জানতে পারলে সন্তানের ওপর অধিক মায়া মমতা থেকে অভিভাবকেরাই অনেক সময় ভুল কাজ করে বসেন। তিনি একটি উদাহরণ তুলে দিয়ে বলেন, একটি বাচ্চা হয়তো তার বাবার মানিব্যাগ থেকে পয়সা চুরি করেছে। বাবার কাছে ধরা পরার পর তাকে ভুলটা সেই মুহূর্তে না ধরিয়ে দিয়ে তারই সামনে তার 'মা' বা বাড়ির কোনও সদস্য তাকে প্রশয় দিয়ে বলেন যে, সে ওই টাকাটি চুরি করেনি, তাকে দেওয়া হয়েছে। ফলে তার অন্যায় কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। ভবিষ্যতে ওই শিশুটি কোনও বড় অন্যায় করবে করতে পারে। বড় বয়সে তাকে শোধরানোর থেকে ছোট বয়সে তাকে তার ভুলটা ধরিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ একজন অভিভাবককে বুঝতে হবে অন্যায়কে কখনোই প্রশয় দেওয়া উচিত নয়। একটি বাচ্চা যখন কোনও মিথ্যের আশ্রয় নেয়, বা টাকা চুরির মতো কোনও অপরাধ করে সে যদি ধরা না পড়ে তখন সে ভিতরে ভিতরে আলাদাভাবে খুশি অনুভব করে। ভবিষ্যতে এটি মানসিক রোগের কারণ হতে পারে। আর এই ধরনের সমস্যার জন্ম নিলে সেটি পরবর্তীতে নিজের বা তার পরিবারের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই একজন অভিভাবককে সন্তানকে বড় করে তুলতে হলে খুব সচেতনভাবে সমস্ত দিক খেয়াল রাখা উচিত।

নিজের সন্তানকে শেখান সে যদি কোনও মিথ্যের আশ্রয় নেয় তাহলে তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। সে যদি তার কোনও বন্ধুকে মিথ্যে কথা বলে তাহলেও তার ফলও তাকেই পেতে হবে।

সেইসঙ্গে শেখান তার নিজের কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। যাতে নিজের পড়ার বইগুলো গুছিয়ে রাখা, বা বাড়িতে পড়ার সময় হোমওয়ার্ক তৈরি করে নেওয়া, নিজের খাবার প্লেট নিজে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে আসার কাজগুলি যেন নিজে করতে পারে।

মিথ্যে কথা বলার প্রবণতার সঙ্গে তার স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ অনুভূতি গুলিকে গুলিয়ে ফেলবেন না। দেখবেন অনেক সময় একটি শিশু টিভি দেখে বা রূপকথার কোনও গল্প শুনে নানান কল্পনার আশ্রয় নেয়। সেক্ষেত্রে সে কিন্তু কোনও মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে না। এটি কোনও খারাপ বিষয় নয়। তবে সন্তানের মিথ্যে বলার প্রবণতার জন্য কোনওভাবেই তাকে দোষ দিয়ে হতাশায় ভুগবেন না। উলটে সমস্যা এলে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করুন।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ২০১৭

চিনের প্রাচীর ও একটি ইতিহাস

চিনের প্রাচীর বা গ্রেট ওয়াল অফ চায়না-র নাম আমরা সবাই শুনেছি। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাচীর। ভারী অদ্ভুত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬৯৫ কিলোমিটার। প্রায় ১৬৮৪ মাইল। উচ্চতা ৪.৫৭ থেকে ৯.২ মিটার। প্রায় ১৫ থেকে ৩০ ফুট। চওড়ায় প্রায় ৯.৭৫ মিটার বা ৩২ ফুট। চিনের প্রাচীর তৈরি করা আরম্ভ হয়েছিল ২২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। শেষ হতে লাগে প্রায় ১৫ বছর। তৈরি হয় ইট আর পাথর দিয়ে। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে এরকম একটা বিরাট আকৃতির প্রাচীর তৈরি করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? তার পিছনেও রয়েছে এক ইতিহাস।

মাঞ্চুরিয়া আর মঙ্গোলিয়া যাযাবর দস্যুদের হাত থেকে চিনকে রক্ষা করার জন্য এই গ্রেট ওয়াল অফ চায়না তৈরি করা হয়েছিল। ২৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চিন বিভক্ত ছিল খণ্ড খণ্ড রাজ্যে আর প্রদেশে। এদের মধ্যে একজন রাজা ছিলেন। যাঁর নাম ছিল ষি হুয়াং-টি, তিনি অন্যান্য রাজাদের সংঘবদ্ধ করেন এবং নিজে সম্রাট হন। চিনের উত্তরে গোবী মরুভূমির পূর্বে দুর্ধর্ষ মঙ্গলদের বাস ছিল। যাদের কাজ ছিল প্রধানত লুঠতরাজ করা। এদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সম্রাটের আদেশে চিনের প্রাচীর তৈরির কাজ আরম্ভ হয়। প্রাচীর তৈরি হয়েছিল চিহলি-পুরনো নাম পোহাই উপসাগরের কূলে শানসিকুয়ান থেকে কানসু প্রদেশের চিয়াকুমান পর্যন্ত।

কিন্তু এত কষ্ট করে যে প্রাচীর তৈরি করাটাই সার হয়েছিল। কারণ আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এই প্রাচীর তৈরি করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। প্রাচীরের অনেক জায়গা প্রায়ই ভেঙে পড়ত অথবা মঙ্গোল দস্যুরা ভেঙে ফেলে চিনের মূল ভূখণ্ডে লুঠপাট করার জন্য ঢুকে পড়ত। বর্তমানে প্রাচীরটি ঐতিহ্যের কারণে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হলেও প্রাচীরের অনেক জায়গা ভেঙে পড়েছে। আর চিনারা নিজেরাই প্রাচীরের বাইরে চাষ-বাস আরম্ভ করেছে।

চায়নায় এই চিনের প্রাচীরটি ছাং ছং বা দীর্ঘ প্রাচীর নামে পরিচিত। দীর্ঘ এই প্রাচীরের সারির প্রায় পুরোটাই মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি।

১৮৬০ সালে শেষ হওয়া দ্বিতীয় অপিয়াম যুদ্ধের পর চায়নার বর্ডার বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলেই ব্যবসায়ী এবং দর্শনার্থীরা এই মহাপ্রাচীর সম্বন্ধে প্রথম ভালোভাবে জানতে পারে। এর আগে পর্যন্ত সারা বিশ্বে এর তেমন কোনও পরিচিতি ছিল না। ধীরে ধীরে চিনের এই মহাপ্রাচীর দর্শনার্থীদের আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই প্রাচীর খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং একে ঘিরে নানা রকম মিথ বা জনশ্রুতি তৈরি হতে থাকে। চিনের এই প্রাচীরকে নাকি চাঁদ এমনকী মঙ্গলগ্রহ থেকেও দেখা যায়। এখনও লোক মুখে এই কথা প্রচারিত।

২০০৯ সালে এই প্রাচীরে লুকিয়ে থাকা ১৮ কিলোমিটার অংশ নতুন করে আবিষ্কার করা হয়। এই অংশটি পাহাড় এবং খানাখন্দের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। এই অংশ খুঁজে বের করতে 'ইনফ্রারেড রেঞ্জ ফাইন্ডার' এবং 'জিপিএস সিস্টেম' ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রথম দিকে প্রাচীরের দেওয়ালটি মাটি, কাঠ এবং পাথর দিয়ে তৈরি করা হত। মিং সাম্রাজ্যের সময়ে চুন, ইট আর পাথরের ব্যবহার অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। এই প্রাচীর থেকে সীমান্তরক্ষীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে সীমান্ত পাহারা দিত। পাহাড়ের চূড়ায় বা অনেক উঁচুতে সিগন্যাল টাওয়ারগুলো ছিল। ফলে এসব টাওয়ার থেকে কোনও সতর্কতা বা বিপদ সংকেত দেওয়া হলে তা খুব সহজেই বোঝা যেত।

২০১৪ সালে লাইয়াওনিং এবং হেবেই প্রদেশের বর্ডারের কাছের দেওয়ালগুলো কনক্রিট দিয়ে নতুন করে সংস্কার করা হয়। চিন সরকারের এই সংস্কার উদ্যোগ তখন বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিল। ২০১২ সালের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অভ কালচারাল হেরিটেজ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যমতে, মিং সাম্রাজ্যের সময় ২২ শতাংশ সাম্রাজ্যই তৈরি হয়। বর্তমানে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি হল চিনের মহাপ্রাচীরের যে অংশ গানসু প্রদেশে অবস্থিত সেই অংশটি। তার ৬০ কিমি বা তার বেশি অংশ আগামী ২০ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আজ কালের আবর্তে শুধু চিনের নয় গোটা বিশ্বের গৌরব চিনের এই প্রাচীর আজ অনেকটাই ধ্বংসের মুখোমুখি। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর এর প্রতি চিন সরকার যেমন যত্নবান হয়েছেন তেমনি ব্যাপক পরিচিতির ফলে একে প্রতি নিয়ত লাখ লাখ পর্যটকদের চাপ সামলাতে হচ্ছে। তবে চিন সরকার যদি এর সংস্কারের প্রতি আরও মনোযোগী হয়ে ওঠে তাহলে হয়তো আরও অনেকদিনই সপ্তস আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম একটি ঐতিহ্যকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

আগামী সংখ্যায়
জেনারেল নলেজ
অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি
বৈকাল হ্রদ